ATHENA, VOLUME IX, JULY 2025 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 196–202
www.athenajournalcbm.in

স্বাধীনতা আন্দোলনে নদিয়ার নারী

ড. সমীর মণ্ডল*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৫ পরিমার্জন: ০৪.০৫.২০২৫ গৃহীত: ২০.০৫.২০২৫

সারসংক্ষেপ: *ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সংগঠিত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সাধারণভাবে পুরুষেরাই অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সেকথা ইতিহাসে বেশি আলোচিত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে সমাজের বহু নারী এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। নদিয়া জেলার বহু নারী এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের কথা ইতিহাসে প্রায় আলোচিত হয় নি বললেই চলে। পারিবারিক বিভিন্ন বাধা, সমাজের একাংশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বহু নারী মাতৃভূমিকে ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার যজ্ঞে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে অবিভক্ত ভারতের নদিয়া জেলার নারীদের একাংশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করবো যে নদিয়ার বেশ কিছু নারী জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে, জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন ঘটনা স্বচক্ষে দেখে, বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের মুক্তির জন্য যতটা সম্ভব করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে অনেকটা শক্তি যুগিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের এই সংগ্রামী মানসিকতা সমাজের বহু নারীকে অনুপ্রাণিত করেছিল ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করবো যে বহু নারী তাঁদের বিবাহের পরও স্বামীর সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের মুক্তি সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেল। এই সকল নারীদের অদম্য লড়াই দেশের স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করেছিল।*

সূচক শব্দ: *নদিয়া, নারী, সংগঠন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, জাতীয় কংগ্রেস, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, কারাদণ্ড।*

*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ নাকাশিপাড়া, মুড়াগাছা, নদিয়া।
e-mail: samirmandalchal@gmail.com

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্নভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ-বিরোধী এই আন্দোলনগুলিতে সাধারণভাবে পুরুষেরাই অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সেকথা ইতিহাসে বেশি আলোচিত। তবে সেই সঙ্গে সমাজের বহু নারী এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সক্রিয় এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। অবিভক্ত ভারতের নদিয়া জেলার বহু নারী এই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের কথা ইতিহাসে প্রায় আলোচিত হয় নি বললেই চলে। এই প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করবো যে নদিয়ার বেশ কিছু নারী জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে, জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন ঘটনা স্বচক্ষে দেখে এবং বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের মুক্তির জন্য যতটা সম্ভব করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে অনেকটা শক্তি যুগিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের এই সংগ্রামী মানসিকতা সমাজের বহু নারীকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ব্রিটিশ সরকারও উপলব্ধি করেছিল নারীদের প্রকৃত ক্ষমতা উপেক্ষা করা যাবে না। এইভাবে নারীদের অনমনীয় ব্রিটিশ-বিরোধীতা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে জোড়দার করেছিল।

প্রতিবন্ধকতা

তৎকালিন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নদিয়া জেলার নারীদের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। বহু নারীর ক্ষেত্রে পারিবারিক বিভিন্ন বাধা ছিল। এই বাধার কোনো সীমা ছিল না। সমাজের একাংশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করা খুব কঠিন ছিল। অনেকে অভিভাবকদের অনুমতি পেতেন না। অভিভাবকেরা সমাজের নিন্দার ভয় পেতেন, ভয় পেতেন কন্যার বিবাহ না হওয়ার। এছাড়াও তাঁদের ছিল কন্যার ওপর পুলিশের অত্যাচারের ভয় ও আতঙ্ক। তাই তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের কন্যাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে চায়তেন না। আবার সেই সময় কোনো সরকারি চাকুরীতে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বাড়ির কেউ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেই সরকারি কর্মচারীকে এইজন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। এমনকি এই অপরাধে তাঁর চাকরিও চলে যাওয়ার ভয়ও থাকত। ফলে নারীদের ক্ষেত্রেও এই প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রেক্ষাপট

তবে এই সকল বাধা, ভয় ও আতঙ্ক উপেক্ষা করে বহু নারী মাতৃভূমিকে ব্রিটিশের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার যজ্ঞে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। এই সকল নারীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার পশ্চাতে কতগুলি বিষয় বিশেষভাবে কাজ করেছিল। বিভিন্ন সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলন নারীদের সচেতন করেছিল। নারী শিক্ষার প্রসার তাদের সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছিল। আবার মহাত্মা গান্ধির আদর্শ ও নেতৃত্বে পরিচালিত গণ আন্দোলনগুলিতে এবং জাতির কল্যাণকর সকল কাজে পুরুষের সঙ্গে সমান দায়িত্ব নিয়ে নারীরাও একসঙ্গে চলার প্রেরণা লাভ করেছিল।[১] এছাড়া তৎকালীন যুব নেতৃত্ব সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শ ও কার্যকলাপ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীদের সঙ্গে নদিয়ার অনেক নারীকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[২]

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেত্রীবৃন্দ এবং তাদের কার্যকলাপ

নদিয়া জেলার অন্যতম নারী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন শ্রীমতী অপর্ণা বন্দোপাধ্যায়। তাঁর পিতা পেশায় উকিল বৈদ্যনাথ অধিকারী যখন কুষ্টিয়াতে বসবাস করতেন তখন অপর্ণা বন্দোপাধ্যায় শিবকালী মণ্ডল এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত তরুণ সংঘ পাঠাগারের মাধ্যমে রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হওয়ার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শৈশবে তিনি তাঁর মেজমামা বিপ্লবী বীরেন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে ব্রিটিশ-বিবোধী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যিনি শহীদ অনন্তহরি মিত্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে নদিয়ার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য ও নির্মলনলিনী ঘোষ তাঁকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু কৃষ্ণনগরে এক মহিলা সভায় মেয়েদের কাছে অলঙ্কারের জন্য আবেদন জানালে অপর্ণা বন্দোপাধ্যায় তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে অপর্ণা বন্দোপাধ্যায় ঐ বছর জানুয়ারি মাসে নিজ গৃহে তিন মাসের জন্য অন্তরীণ হন। আবার ফেব্রুয়ারি মাসে মহাত্মা গান্ধির সহধর্মিণী কস্তুরবাঈ গান্ধির গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সরকারি অর্ডিন্যান্স অমান্য করে তিনি মহিলাদের একটি মিছিল পরিচালনা করেন। এই অপরাধে কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসকের আদেশে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়।[৩]

নদিয়ার আরও এক বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন ইন্দুনিভাননী দেবী। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলনলিনী ঘোষ প্রমুখের কার্যকলাপ তাঁকে দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শার্দূল সিং-এর নির্দেশে নদিয়া জেলা কংগ্রেস সরকারি ভবনে পতাকা উত্তোলন করে 'পতাকা সত্যাগ্রহে'র কর্মসূচী নদিয়া জেলা কংগ্রেস গ্রহণ করে। তখন ইন্দুনিভাননী দেবী কৃষ্ণনগর জজকোর্টে পতাকা উত্তোলন করেন। সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা অমান্য করে এবং পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি সত্যাগ্রহী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এরপর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করলে কৃষ্ণনগর শহরে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষপর্যন্ত পুলিশ তাঁকে কারাদণ্ড না দিয়ে নিজ গৃহে অন্তরীণ করে রাখেন।[৪]

আবার নির্মলনলিনী ঘোষ নদিয়া জেলার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তাঁর স্বামী রামেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময় কোনো সরকারি কর্মচারীর বাড়ির কেউ কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেই সরকারি কর্মচারীকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। এমনকি এই অপরাধে তাঁর চাকরিও চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত। এই কারণে দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিতে নির্মলনলিনী ঘোষ নিজের বাড়ি ত্যাগ করে কৃষ্ণনগরে উকিলপাড়ায় একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। তাঁর দেবর শশীন্দ্রনাথ ঘোষও স্বাধীনতা-সংগ্রামে যুক্ত থাকতে তাঁদের নিজস্ব বাড়ি ত্যাগ করে এই বাড়িতেই থাকতেন। নির্মলনলিনী ঘোষের আন্তরিকতায় এই বাড়ি কংগ্রেসের একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেই সময়ে সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে একজন নারীর নিজের বাড়ি ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকা এবং সেখানে অন্যান্য পুরুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সঙ্গে একযোগে দেশের মুক্তির জন্য কাজ করা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহত্মা গান্ধির ডাকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে নির্মলনলিনী ঘোষ নদিয়া জেলায় কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। প্রথমে তাঁকে কৃষ্ণনগর জেল, পরবর্তীকালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, এমনকি হিজলি স্পেশাল জেলে তাঁকে বন্দী থাকতে হয়েছিল।[৫] সমসাময়িককালে প্রকাশিত পত্রপত্রিকাগুলিও এই অগ্নিময় দিনগুলির চিত্র তুলে ধরেছে। যেমন কৃষ্ণনগর থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় প্রকাশিত 'অগ্নিশিখা' (১৯৩২) এবং ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রকাশিত 'মুক্তির ডাক' (১৯৪২) নামে দুইটি হাতে লেখা ও সাইক্লো-স্টাইল করা পত্রিকা ব্রিটিশ-শাসন কাঠামোর ওপর আঘাত হেনেছিল এবং এই পত্রিকা দুইটি নদিয়ায় ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছিল।[৬]

আরও একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রফুল্লবালা বিশ্বাস নদিয়ার তেহট্টের সাহেবনগরের বাসিন্দা ছিলেন। নদিয়ার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, নির্মলনলিনী ঘোষ, বিমল মুখোপাধ্যায়, সত্যেশ ভট্টাচার্য, গুণদা মজুমদার, স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখের কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রফুল্লবালা বিশ্বাস দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর স্বামী গোস্টবিহারী বিশ্বাস তাঁর সকল কর্মে তাঁর পাশে ছিলেন। এই সমর্থন সঙ্গে নিয়ে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে যখন কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল, তখন ব্রিটিশ ঘোড়সওয়ার পুলিশ মহিলা সত্যাগ্রহীদের উপর চড়াও হলে প্রফুল্লবালা বিশ্বাস অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সার্জেন্ট-এর ঘোড়ার বল্গা ধরে

এই আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।[৭] একজন সাধারণ গৃহবধুর এই ধরনের তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মানসিকতা এবং ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ-বিরোধী কার্যকলাপ তৎকালীন সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর এই সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলে তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল মেহেরপুরে, কৃষ্ণনগরে এবং কলকাতার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। এইভাবে তাঁকে পর্যায়ক্রমে তিনবারে প্রায় দুই মাস মেহেরপুর সাব জেলে, রানাঘাট সাব জেলে এবং কলকাতায় লালবাজার থানায় আটক থাকতে হয়েছিল। তবে তাঁর কোনো কারাদণ্ড হয়নি।

স্বদেশপ্রেমিক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নদিয়ার লোকনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং ভারতের মুক্তি-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিলেন। মহত্মা গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২) যখন শুরু হয়, তখন তিনি এম এ ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি কারাবরণ করেছিলেন।[৮] আবার দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য তিনি কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন, যেমন 'বিজলী', 'উপাসনা', 'অভ্যুদয়'। এই পত্রিকাগুলি স্বদেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ছিল। এছাড়া তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁর দেশাত্মবোধক চিন্তাভাবনা তুলে ধরেছিলেন। তাঁর লেখা এই ধরণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো 'আহিতাগ্নি', 'রক্তলেখা', 'বন্দনা', 'চিত্তরঞ্জন' প্রভৃতি।

আবার নদিয়ার বীণাপানি মজুমদার স্বদেশভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বীণাপানি মজুমদার এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী মহিলা সংগঠনের নির্মলনলিনী ঘোষের নেতৃত্বে পিকেটিং, প্রভাতফেরী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রচারকার্যে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।[৯] এছাড়া তিনি কৃষ্ণনগরের বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাতকুমার মজুমদার বাল্যকাল থেকেই সমাজসেবা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে আগ্রহী হয়েছিলেন।

রোহিতবালা বিশ্বাস নদিয়ার নাকাশিপাড়া অঞ্চলের শিবপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নদিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা রামপদ সাহা, পঞ্চানন সিংহরায়, সত্যেশ ভট্টাচার্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কাছ থেকে। এছাড়া বিভূতিভূষণ বিশ্বাস এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁদের প্রেরণা এবং নিজস্ব তাগিদে তিনি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তেহট্টে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিলেন। ফলে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। কৃষ্ণনগর আদালতের রায়ে তাঁর সাত মাসের কারাদণ্ড হয়।[১০]

১৯৩০-এর দশকে ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ-বিরোধী যে ব্যাপক জন-রোষ দেখা দিয়েছিল, তাতে আরও এক স্বাধীনতা সংগ্রামী শৈলবালা মজুমদার সামিল হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ায় ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সময় তিনি রাজনৈতিক কর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এমনকি কৃষ্ণনগরে তাঁর বাড়িতে তাঁদের তিনি আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। সেই সময় অনেক পিতা-মাতা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শ থেকে তাঁদের সন্তানদের দূরে রাখতেন সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিন্তু শৈলবালা মজুমদার তা করেন নি। বরং তাঁরই উৎসাহে তাঁর তিনপুত্র গোপীনাথ মজুমদার, জগন্নাথ মজুমদার ও কাশীনাথ মজুমদার এবং একমাত্র কন্যা সুপ্রীতি মজুমদার ব্রিটিশ-বিরোধী সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সেই সময়ে একজন সাধারণ গৃহবধু নিজে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, নদিয়ার বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন, আবার নিজের পুত্রদের, এমনকি একমাত্র কন্যাকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছেন – এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ফলে তাঁর সন্তানেরাও পুলিশী নির্যাতন ভোগ করেন এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিতও হয়েছিলেন।[১১] এছাড়া তাঁর

তৈরি মহিলা সংগঠনের সঙ্গে নির্মলনলিনী ঘোষ, বিভা দাস, মৃণালিনী দে, ইন্দুনিভাননী বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণাপাণি মজুমদার, সরযূ সরকার প্রমুখ যুক্ত ছিলেন।

আরও একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী নদিয়ার বেথুয়াডহরীর বাসিন্দা সাবিত্রী দেবী দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলীতে সক্রিয়ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে তিনি ছিলেন নাকাশিপাড়া কংগ্রেস মহিলা সমিতির সম্পাদক। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর বাড়ি তল্লাসী করে এবং একটি বন্দুক বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি, 'স্বাধীনতা দিবস'-এ একটি জনসভায় তিনি এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ-বিরোধী তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন এবং বিচারে তাঁর তিন মাসের কারাদণ্ড হয়।[১২] এরপর আইন অমান্য আন্দোলনের জোয়ারে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তেহট্ট ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাজনা-বন্ধের এক আন্দোলন চলছিল। সেই সময় এক জনসভায় তিনি খাজনা-বন্ধের পক্ষে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই অপরাধে মেহেরপুর মহকুমা আদালতে তিনি আবার ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।

নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার (সান্যাল) তাঁর মা শৈলবালা মজুমদারের কাছ থেকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর মায়ের উৎসাহে শৈশবেই তিনি নদিয়ার বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দপদ দত্ত, মহাদেব সরকার প্রমুখের সংস্পর্শে এসেছিলেন। আবার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যাপক বীরেশ্বর বসু সরকারি চাকরি ছেড়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই ঘটনা সুপ্রীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উদগ্রীব ছিলেন। এছাড়া তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমেও জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম প্রচার করেছিলেন।[১৩] ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বিচারে তাঁকে এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি ছিলেন কনিষ্ঠা নারীকর্মী যিনি মাত্র ১২ বছর বয়সে আইন অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন।[১৪] এই দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে বিরল।

আবার নদিয়ার তেহট্টের বাসিন্দা শ্রীমতী প্রমদা দাস জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন নদিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রেরণায়। তাঁরা হলেন ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, ডঃ নৃপেন বসু এবং লাবণ্যলতা চন্দ। এছাড়া তাঁর রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে সত্যেশ ভট্টাচার্য, স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমর মুখার্জী প্রমুখ নদিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতারা সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে নদিয়ার তেহট্ট থানার অন্তর্গত চাঁদেরঘাটে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনে প্রমদা দাস সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। মেহেরপুর আদালতের রায়ে তাঁর তিন মাসের জেল হয়। কৃষ্ণনগর জেলে তিন মাস বন্দী থাকার পর তিনি মুক্তি পান। এরপর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য শান্তিপুরের বিশ্বমোহন সান্যাল এবং কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণ ব্যানার্জীর সঙ্গে প্রমদা দাস হাঁটা পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের তিন জনকে কৃষ্ণনগরেই গ্রেপ্তার করেন। কৃষ্ণনগর কোর্টের রায়ে প্রমদা দাস ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বহরমপুর জেলে তিনি ছয় মাস আটক থাকেন।[১৫]

এরপর মহত্মা গান্ধির আহ্বানে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন শুরু হলে কুমিল্লা অভয় আশ্রমে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, নৃপেন বসু, যমুনা ঘোষ ও লাবণ্যলতা চন্দের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে প্রমদা দাস দেড় বছর বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করেন। এই সময় পিকেটিং করার অভিযোগে তাঁকে দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফলে

বীরভূমের সিউড়ি জেলে তাঁকে দেড় বছর আটক থাকতে হয়েছিল। এর আগে তাঁকে আরও ১৮ দিন হাজতবাস করতে হয়েছিল।[১৬] ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কস্তুরবা-ট্রাস্টের কাজ নদিয়া জেলার সাহেবনগর গ্রামে শুরু হয়েছিল।[১৭] বাংলায় কস্তুরবা-ট্রাস্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিলেন লাবণ্যলতা চন্দ। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাহেবনগরের 'কস্তুরবা গ্রাম সেবিকা শিক্ষণ শিবির'-এর সঞ্চালিকা ছিলেন নিরুপমা দেবী।

অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ

উপরে উল্লেখিত নারী স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছাড়াও আরও অনেক নারী দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা ইতিহাসে প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছেন। ১৯৩০-এর দশকে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার তাঁদেরকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। যেমন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেছিলেন বিভারানি দাসী, হরিদাসী বৈষ্ণবী, লীলাবতী দেবী, মৃণালিনী দে, উষালতা দেবী, নন্দরানি বিশ্বাস, সাবিত্রী দাস প্রমুখ নারী।[১৮]

লোকশিল্পে প্রতিফলন

আবার নদিয়ার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত লোকশিল্পীদের 'সাঁকফলী গান' ('সাঁকফল' বলতে 'সাচ্চাফল' অর্থাৎ 'সত্যধারা' বোঝানো হয়েছে)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের কাহিনিও তুলে ধরা হয়েছে। এই গানের বিভিন্ন ব্রতকথাতেও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে, যা নারীদের মুখে মুখেও ধ্বনিত হতো। এই ব্রতকথাগুলি সাধারণ নারীদের রাজনৈতিক চেতনারও প্রমাণ দেয়। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শহীদ স্মরণ'।[১৯] এখানে বলা হয়েছে

শোন গো শোন গো সবে করি নিবেদন,
সাঁকফলের ছড়ায় করি শহীদ স্মরণ।
মোদের দেশ ভারতে জন্মেছিলেন যারা
প্রফুল্ল, বাঘা যতীন, মাতঙ্গিনী হাজরা
বিনয়-বাদল-দীনেশ আর সূর্য সেন ছিল
প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার, ভগত সিং এল।
রাসবিহারী দেশের জন্য করেন অনেক কাজ
ভুলিতে না পারি মোরা ক্ষুদিরামে আজ।।
মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ দেশের সেবায় রত
দেশকে স্বাধীন করাই ছিল ওঁদের ব্রত।

উপসংহার

এইভাবে নদিয়ার অনেক নারী তৎকালীন সমাজের লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করে, বিদেশী শাসকদের রক্তচক্ষু নিশঙ্কচিত্তে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ-শাসন বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। এই সকল নারীদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রেরণায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক নারী সীমাহীন ভয় উপেক্ষা করে, হাসিমুখে বিচিত্র ধরণের নির্যাতন বরণ করে দেশের স্বাধীনতার লড়াই-এ সামিল হয়েছিলেন। আমাদের আলোচনায় যে সকল নারীর নাম উঠে এসেছে, তাঁদের অধিকাংশই বিবাহের পরও স্বামীর সক্রিয় সহযোগিতায় দেশের মুক্তি সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেল। আবার শ্রীমতী সুপ্রীতি মজুমদার (সান্যাল)-এর মতো নারী বিবাহের পূর্বে এবং পরেও দেশের মুক্তির জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এই সকল নারীদের এই অদম্য লড়াই দেশের স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করেছিল এবং ভবিষ্যতের নারীদের জন্য পথের নিশানা তৈরি করে দিয়েছিল, যা সার্বিকভাবে নারীমুক্তি আন্দোলনকে জোড়দার করেছিল।

সূত্রনির্দেশ:

১. দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী*, বসুধারা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৪।
২. নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি, (১৯৭৩), *স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া,* নদিয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, সারকিট হাউস, কৃষ্ণনগর, পৃ. ২১০।
৩. *তদেব*, পৃ. ২১০।
৪. *তদেব*, পৃ. ২২২।
৫. *তদেব*, পৃ. ২৭৬।
৬. নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, (১৯৭৩), *নদীয়া: স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ,* কৃষ্ণনগর, পৃ. ৩৬।
৭. নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি, (১৯৭৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮৫।
৮. ঘোষ, নিতাই, (২০০৮), *নদীয়ার গৌরব*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ৩৩।
৯. নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি, (১৯৭৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৬।
১০. *তদেব*, পৃ. ৩২৫।
১১. *তদেব*, পৃ. ৩৩৫।
১২. *তদেব*, পৃ. ৩৫৭।
১৩. নদীয়া জেলা নাগরিক পরিষদ, (১৯৭৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।
১৪. নদীয়া জেলা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতি, (১৯৭৩), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬১।
১৫. *তদেব*, পৃ. ২৮৬।
১৬. *তদেব*, পৃ. ২৮৬।
১৭. দাশগুপ্ত, কমলা, (১৩৬৭), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯।
১৮. *তদেব*, পৃ. ২৯১।
১৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস, (২০১০) *ইতিহাসের আলোকে নদিয়া ও নদিয়ার লোকসংস্কৃতি*, তমোরি প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১১৭।